Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 288 - 293
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 288 – 293
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ভাদু পূজার উৎস ও ইতিহাস সন্ধান

মধুমিতা পাল
গবেষিকা, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: madhuaita2009madhu@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Bhadu Puja, Bhadreshwari, Bhadravati, Manbhum, Bhadu Devi, Panchet, Chatna, Purulia, South Birbhum, West Burdwan.

Abstract
Different regions of India have different folk song traditions, expressing the Indian way of life through folk songs If you observe the original pattern of creation, you can understand that if you want to know your culture, it is as easy to know it through music as it is not possible through any other subject.In the rural environment, the happiness, sorrow, joy, feelings of the life of the village people are expressed through folk music or folk literature Likewise, the folk music that is making the air in the villages of West Burdwan, South Birbhum and Medinipur is known as 'Bhadu' music.'Bhadu' is a special phase of the social life of Manbhum In the post-sastra social life, 'Bhadu Devi' is popularized through the folk music of Manbhum. To trace the origin of Bhadu, like any other folk culture or folk festival, one has to resort to conjecture. Because when and where and who started these folk festivals, it is not possible to determine exactly They flow according to the infallible rules of time According to the legend, King Panchkot celebrated this festival to commemorate his only daughter Bhadu Devi The origins of most folk cultures are speculative Due to this, it has not been possible to determine the exact origin of folk festivals since ancient times. Similarly, history and assumptions have to be resorted to in determining the source of Bhadu-puja In tracing the source according to the sequence of events we find that the king of Kashipur in Purulia district had a very beautiful daughter named Bhadreshwari or Bhadravati, Bhadu Puja is said to be practiced to commemorate Bhadravati's untimely death and her memory, there is also another popular story,A battle between the king of Panchet or the king of Chatna takes place in the month of Bhadra and the 'Bhadu' festival is celebrated as the victory festival of the king of Panchet who won the war. Others have commented that Bhadu Festival is a version of Purulia's Purulia community's Karam Festival Such traditional stories are heard in search of the origin and history of Bhadu Puja.

Discussion

ভাদুর উৎস সন্ধান করতে গেলে অন্য লোকসংস্কৃতি বা লোক উৎসবের মতোই অনুমান আশ্রয় করতে হয়। কেননা এই ধরনের লোক উৎসবগুলি ঠিক কবে কোথায় কি প্রসঙ্গে বা কারা শুরু করেছিলো, তা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কালের অমোঘ নিয়মে এগুলো বয়ে চলেছে। ঠিক তেমনই কবে কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী ভাদু উৎসবের সূচনা করেছিলেন তার কোন সঠিক প্রমানাদি নেই, আছে প্রচলিত কিছু কিংবদন্তি বা জনশ্রুতি, আর আছে একমাত্র তথ্য হিসেবে কিছু ভাদু গান যার অধিকাংশই ছড়িয়ে আছে ভাদুপালনকারিণীদের স্মৃতির পটে। সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাবে বহু গান আবার অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ বীরভূম ও মেদিনীপুরের বিস্তৃত অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে যে লোকসংগীতগুলি ছড়িয়ে আছে তার খবর গ্রামীন পরিবেশ ছেড়ে বৃহত্তর বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। তার কারণ বোধ হয় উৎসাহী সংগ্রাহকের অভাব। এই অঞ্চলে একসময় এই লোকসঙ্গীত আকাশ বাতাস মুখরিত করে রাখত, কিন্তু বর্তমান বংশধরদের কাছে এই লোকসঙ্গীতগুলি অচেনা অজানা হয়ে আছে। তবুও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলা যায়, ঐ সকল অঞ্চলের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাদু গান অনেক খানি ম্লান হয়ে গেলেও, তবু বেঁচে আছে। ভাদু মানভূমের সমাজ জীবনের এক বিশেষ গণ পর্ব। শাস্ত্রোত্তর সমাজ জীবনে 'ভাদু দেবী' মানভূমের লোক সঙ্গীতের মাধ্যমে চিন্ময়ীরূপে জন মনে আদৃতা। প্রধানত এই সব অঞ্চলে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে ভাদু পরব আনন্দে উদ্‌যাপন করে থাকেন।[১] প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী কথিত আছে পঞ্চকোট রাজা তাঁর এক মাত্র কন্যা ভাদু দেবীর স্মৃতি রক্ষার্থে এই পরব প্রথম উদযাপন করেন। তাই এখন তাঁর স্মরনার্থে ভাদু গান গীত হয়। নীচের গানটিতে তার উল্লেখ আছে।

> "চল কাশীপুরে রাজ দরশন করবোগা নয়নভরে।
> কাশীপুরে ভাদু পূজা, মানভূমেতে কে করে
> পঞ্চকোট রাজার দৌলতে দেখ এখন সবার ঘরে।"[২]

যে কোন প্রাচীন উৎসব কখন কোথায় কবে আত্মপ্রকাশ করেছে বা কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে, তা সঠিকভাবে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য, অধিকাংশ লোকসংস্কৃতির উৎপত্তিকাল অনুমানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বাংলার লোকসংস্কৃতি কোন বিশেষ গোষ্ঠীর সৃষ্টি নয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন উপাদান নিয়ে যেমন লোকসমাজ গঠিত হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সমাজবদ্ধ ভাবে এক এক স্থানে বসবাস করার ফলে আঞ্চলিক লোকউৎসব ও তাকে অবলম্বন করে লোকসংস্কৃতরি জন্মলাভ ঘটেছে। এই কারণে প্রাচীন লোকউৎসবগুলির সঠিক উৎপত্তি কাল নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তথ্যের উপর নির্ভর করে এক আনুমানিক কালে আমরা পৌঁছাতে পেরেছি। ঠিক তেমনই ভাদু উৎসবের উৎপত্তি নিয়ে এই অঞ্চলে নানান কিংবদন্তি প্রচলিত আছে, সেগুলি নিয়ে নানা রকম মতভেদও আছে। আলোচনার সুবিধার্থে অর্থাৎ ভাদু সঙ্গীতের পর্যায়ক্রমে আলোচনার পূর্বে এই সকল কিংবদন্তিগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা হল।

উৎস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একটি প্রচলিত কাহিনীর কথা উল্লেখ করলাম। যদিও কাহিনীটি প্রমাণের অভাবে সত্যতার প্রশ্ন তুলেছেন সুব্রত চক্রবর্তীর ভাদু গ্রন্থে প্রচলিত কাহিনীটি এইরূপ। পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরের রাজার এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল, তার নাম কেউ বলেছেন ভদ্রাবতী, কেউ বলেছেন ভদ্রেশ্বরী। ভদ্রেশ্বরী নামটি অধিক প্রচলিত। রাজকন্যার বিবাহ নির্ধারিত হয়েছিল সুপাত্রে এবং বিবাহের রাত্রেই বর আগমনের পথে ভাবী বর ডাকাতদের হাতে নিহত হন ও কন্যা লগ্নভ্রষ্টা হন। লগ্নভ্রষ্টা কন্যা পুকুরে আত্মবিসর্জন দেন। কারো কারো মতে কন্যা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যান, আবার কেউ বলেন তাঁর অকালমৃত্যু হয়েছিল। কন্যা ভদ্রেশ্বরীর স্মৃতি রক্ষার্থেই রাজা পরবর্তী কালে 'ভাদু' উৎসবের প্রচলন করেন। এছাড়াও আরেকটি স্বল্পশ্রুত কিংবদন্তি সুব্রত চক্রবর্তী তাঁর ভাদু গ্রন্থে বর্ণিত করেছেন – শুনেছি যে, ভাদু ছিলেন বিবাহিত এবং অতি ভক্তিমতী, কিন্তু স্বামীর ঘর করতেন না। দেব দেউলে রাত্রি যাপন করতেন। মীরাবাই এর আদলে এ ঘটনা রাজপরিবারের পক্ষে শালীন ছিল না। হয়ত সেই কারণেই রাজকর্মচারীদের সন্দেহের অবসান ঘটে ভাদুর অকাল মৃত্যুতে। সেটা আত্মহত্যাও হতে পারে, হতে পারে চক্রান্তও। উপরোক্ত মতামতগুলি ক্রমান্বয়ে বিশ্লেষণ করলে কোনটির উপরেই নির্ভর করা যায় না। শেষোক্ত স্বল্পশ্রুত জনশ্রুতিটির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়। এই উৎসবের একমাত্র প্রমাণ হিসাবে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 288 - 293
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রাপ্ত ভাদুগানগুলির উপর গুরুত্ব দিতেই হয়। সেক্ষেত্রে ভাদু বিবাহিত, এ কথার কোনো স্বীকৃতি নেই কোনো গানেই বরং প্রাক-বিবাহের মুহূর্তগুলিই অধিক ব্যক্ত। ভাদুকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করতে দেখি একটি গানে,

"বিয়ে করলো ভাদু
সাধের যৌবন ঘুচাসনে শুধু শুধু।"[৩]

বিবাহ অপেক্ষা বিবাহে অনীহাই এখানে অধিক প্রকট। লোকমুখে প্রচলিত ভাদু সঙ্গীতগুলিতে অবশ্য কোথাও ভাদুর বিবাহ বা ভাদুর অকাল মৃত্যুর কোন উল্লেখ আমরা পাইনা। উল্লেখিত কাহিনীর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমান বা উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। আলোচনা প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় হিন্দু রাজন্য সম্প্রদায়ভুক্ত কন্যার বিবাহের দিন ভাদ্র মাসে কিভাবে ঠিক হয়ে ছিল, তবে বহু গানে উল্লেখ আছে ভদ্রাবতী বা ভদ্রেশ্বরী কাশীপুর রাজ্যেরই কন্যা।[৪] যেমন —

"কাশীপুরের মহারাজা
সেকরে ভাদু পূজা
হাতে মা জিলিপি খাজা।"[৫]

যেখানে ভাদুকে রাজকুমারী বিশেষনে চিহ্নিত করা হয়েছে গানটি এই রূপ —

"বেড়ো যাব পদ্ম আনব,
তার বেনাব সিংহাসন,
তার ভিতরে খেলা করে
রাজকুমারী ভাদু ধন।
রাজকুমারী ভাদু আমার
দুখরে মর্ম জানে না
হায় মরি কাঁদে যনা।"[৬]

ভদ্রাবতী বা ভদ্রেশ্বরী যেহেতু কাশীপুরের রাজ পরিবারের কন্যা, ফলস্বরূপ ক্ষেত্র সমীক্ষার ভিত্তিতে কাশীপুরের রাজ পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণতি হল[৭] - ১৯৭২ সালে পঞ্চকোটের রাজ মনিলালের মৃত্যুর পর ভরত শেখর রাজা হন, তার রাজধানী ছিল 'কশেরগড়'। ভরত শেখরের তিন পুত্র ও এক কন্যার নাম যথাক্রমে চেৎসিংহ, শম্ভুনাথ, ভূপতিনাথ ও পঞ্চমকুমারী। ভরতশেখরের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র চেৎসিংহ রাজা হন ১৮১৫ সালে। চেৎসিংহের চার পুত্ররে নাম যথাক্রমে জগজীবন, জগভূষণ, জগমোহন ও রামজীবন। জ্যেষ্ঠ জগজীবন 'গরুড় নারায়ণ' নাম নিয়ে রাজা হন পিতার মৃত্যুর পর এবং তার সঙ্গে কেওনঞ্ঝরেরবিদূষী রাজকন্যার বিবাহ হয়।

এঁদেরই সন্তান নীলমনি সিংহ। এতদূর বলা এ জন্য যে, এ পর্যন্ত রাজধানী ছিল 'কেশরগড়'। রামজীবনের হস্তক্ষেপে পরিচালিত কিছু পারিবারিক কোন্দলের কারণে রাজমহিষীর প্রত্যক্ষ উদ্যোগে রাজধানী কেশরগড় থেকে স্থানান্তরিত হয় 'কাশীপুরে' ১৮৩২ সালে। ১৮৪১ সালে ১৮ বছর বয়সেই নীলমনি সিংহ রাজ্যের কাজ দেখাশুনা করতে থাকেন এবং ১৮৫১ সালে তাঁর আনুষ্ঠানিক অভিষেক হয়। অর্থাৎ কাশীপুরের প্রথম রাজা বলতে নীলমনি সিংহকেই বোঝায়। মহাবিদ্রোহের সময় এই নীলমণি সিংহের ভূমিকা আজও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

সিপাহি বিদ্রোহের সূত্রে পুরুলিয়ায় যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তার মূল নেতৃত্বে ছিলেন নীলমণি সিংহ, তিনি সেখানকার সাঁওতাল আদিবাসীদের সংগঠিত করেছিলেন এবং এই সূত্রই শেষ পর্যন্ত কারাবরণ করেছিলেন নীলমণি সিংহ। স্বদেশে প্রেমের ইতিহাসে নীলমনি সিংহের নাম তাই যেমন স্মরণীয় হয়ে আছে। তেমনি স্মরনীয় হয়ে আছে বহু 'ভাদু' গানেও—

"কাশীপুরের মহল ছিল
ছিল সুখের বিন্দাবন
সে মহলে ঘাস বিরালো
কি করহে নীলমোহন ...
রাণীরা সব কেঁদে বলেন
শুরুগুঞ্জা পাঠাই চিঠি

আমার বাবা পল্টন দিবেন
নীলমনি হবেন ছুটি ...।”[৮]

— এই অর্থে নীলমনি সিংহই হচ্ছে ভদ্রেশ্বরীর পিতা। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ পাই ভাদু উৎসবের বয়স কাল ১৫০ থেকে ২০০ বছর। সে হিসেবে নীলমনি সিংহের বহু আগে এই উৎসব চালু হয়েছে। সময়ের হিসাবে ভরত শেখরের একমাত্র কন্যা পঞ্চকুমারীর কথা মনে আসে। বাংলা মাসের পঞ্চম মাস ভাদ্র এবং ভাদু যে কুমারী এ সমর্থন কিছু গানে পাওয়া যায়। তাহলে পঞ্চকুমারী কোনভাবে লুকিয়ে আছে ভাদুর আড়ালে?

রাজপরিবারের সঙ্গে ভাদুর যোগ সম্পর্ক থাকলেও এ প্রসঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেছেন শ্রী যুধিষ্ঠির মাজী মহাশয়। তাঁর মতে — কাশীপুরের রাজপরিবার উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ভাদুকে নিজের পরিবারের মেয়ে বলে প্রচার করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে লোককথা হিসাবে লোকমুখে প্রচলিত কাহিনীটি হল —

মর্তশোভা দর্শন অভিলাষী দেবী দুর্গা কিছু দিনের জন্য নিরুদিষ্ট হন এবং বনমধ্যে রাজা একটি সুন্দরী কন্যা দেখে তাকে গৃহে আনেন। তার নাম ভাদুরানী। কন্যাহীনা রাজার রাজপুরীতে ধুমধাম, অন্যদিকে উপবাসী শিব কার্তিক ও গণেশের মাতৃব্যাকুলতায় দেবতাদের অনুরোধে মর্তে এসে নারদ দেবীদুর্গাকে চিনতে পারেন এবং স্বর্গের অবস্থা জানান। ভাদ্র মাসের সেই শেষ দিনটিতে দেবী রাজাকে আপন পরিচয় দিয়ে পূজার পরামর্শ দেন এবং স্বর্গে ফিরে যান। সেই থেকে ‘ভাদু’ উৎসবের সূচনা। যুধিষ্ঠির বাবু জানিয়েছেন, এই কিংবদন্তির প্রচারক রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত তৎকালীন পুরোহিত সম্প্রদায় এবং ‘ভাদু’ গানে আগমনী বিজয়া গানের প্রচলন এরই সূত্রে এসেছে।

ভাদুর উৎস প্রসঙ্গে সুব্রত চক্রবর্তী তাঁর ‘ভাদু’ নামক গ্রন্থে আরেকটি কিংবদন্তির কথা উল্লেখ করেছেন - পাঁচেটের রাজার সঙ্গে নাকি ছত্রিনা বা ছাতনার (বাঁকুড়া) রাজার যুদ্ধ হয় ভাদ্র মাসে এবং সেই যুদ্ধে জয়ী পাঁচেটের রাজা বিজয়োৎসব হিসাবে ‘ভাদু’ উৎসবের প্রচলন করেন। তথ্য অনুসারে ১৫৫৩ সালে ছাতনার রাজা ছিলেন হামির উত্তর রায় এবং ১৫৫৪ সালেই ছাতনা পঞ্চকোটের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভাদু উৎসবকে প্রাচীন ধরলে সময়ের দিক থেকে বিশ্বাস মনে হলেও প্রশ্ন এইখানে যে, বিজয় উৎসবের প্রতীক হিসাবে একটি নারীমূর্তি - ভাদুর আগমন কোন সূত্র ধরে? ভাদু নারী সমাজের একান্ত উৎসব, এ সমর্থন যেমন ভাদু গানে আছে তেমনি আছে ভাদু উদ্‌যাপনের বর্তমান ধারার ও প্রকৃতির মধ্যেও।

আবার কেউ কেউ ‘ভাদু’ উৎসবকে পুরুলিয়ার ‘ভূমজি’ সম্প্রদায়ের করম উৎসবের সংস্করণ বলেই কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। ‘করম’ও গীতপ্রধান উৎসব। অবিবাহিতা মেয়েদের এই উৎসবে আছে অবাধ স্বাধীনতা, আছে নিশি জাগরণ। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে বা পার্শ্ব একাদশীর দিনটি এই উৎসবের মূল দিন। ভাদুর সঙ্গে এই উৎসবের কিছু মিলও আছে, যেমন উপবাস, স্নানশুদ্ধি, বাসি খাবার ও আমিষ ভোজনের নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি।

রামশঙ্কর চৌধুরীর তাঁর ‘ভাদু ও টুসু’ গ্রন্থে বলেছেন ছোটনাগপুরের অধিবাসী এবং কুমী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় ভাদ্র মাসে এই উৎসব পালন করেন। এই উৎসব শুরু হয় ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর দিন থেকে। এই একাদশীকে বলা হয় – করম একাদশী, শেষ হয় পূর্ণিমার দিন। একটি ঝুড়িতে পঞ্চশষ্য আর বালি রেখে কিছু লৌকিক আচার এবং সঙ্গীত সহযোগে উৎসব পালন করা হয়। এই গানগুলিকে বলা হয় ‘জাউয়া’ গান। কয়েকটি জাউয়া গানের উদাহরণের মধ্যে দিয়ে এর সঙ্গে ভাদু উৎসবের যে কিছু মিল আছে সেটা দেখা যেতে পারে —

“আজ রে করম ঠাকুর ঘরের দুয়ারে গো
কাল রে করম ঠাকুর কাঁশ নদী বাঁকে।”[৯]

অর্থাৎ করম ঠাকুরকেও ঘরের মানুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আবার বলা হচ্ছে —

“করমঠাকুর যাইয়া হো যাইয়া হো
আর বছর এমন দিনে ঘুরিয়া হো।”[১০]

অর্থাৎ ভাদু যেমন প্রত্যেক বছর ভাদ্র মাসে আসে, তেমনই করম ঠাকুরকেও বছর ঘুরে আসতে বলা হচ্ছে, সাধারণত লোকসঙ্গীতের ভাবগত একটা ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। সেইরকমই করমের কোন কোন গানে ভাদু উৎসবের মিল পাওয়া যায়।

পূর্বে আলোচিত সকল কিংবদন্তির সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। সুব্রত চক্রবর্তী তাঁর 'ভাদু' গ্রন্থে এই রূপ বলেছেন ভাদু উৎসব ফসল ফলানোর উৎসব। ফসলের সঙ্গে এই উৎসবের যোগ সূত্র অত্যন্ত নিবিড়। রোহিনীর দিনটি বীজ ছড়ানোর এক প্রশস্ত দিন বলে আজও গ্রামের মানুষ মনে করেন।

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া মূলত যে দুটি জেলায় উৎসবের শিকড় নিহিত, এই জেলা দুটিতে বিংশ শতাব্দীতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কৃষিজনিত ভৌগোলিক বিরুদ্ধতা, খরা এই অঞ্চলের মানুষগুলির মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমেও দুবেলা দুমুঠো জোটে না, বছরের বেশ কিছু সময় অনাহার তাদের নিত্যসঙ্গী। দারিদ্র ও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা এ অঞ্চলের বেশীর ভাগ নারীর দুর্গতি অপরিমেয়। এছাড়া আছে সমাজ সংসারের অন্ধ কুসংস্কারের বেড়াজাল। যে জাল কেটে বেড়োনোর মত শক্তি তাদের নেই। সমাজে এই নারী সমাজ সুযোগ খোঁজে এই দুঃখ জয় করে এক টুকরো খুশীর সন্ধানে। ভাদু উৎসব যেন তাদের কাছে নির্মল মুক্ত বাতাস গ্রহণের এক অবলম্বন। ভাদোই ধান বা ভাদ্র মাসটিকে তাই গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। পুরোদমে চাষ শুরু হয় জৈষ্ঠের শেষ থেকে চাষ চলে শ্রাবণ পর্যন্ত। আর এই চাষের কাজে সমান ভাবে পুরুষদের সাহায্য করে ঘরের মহিলারা। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে তাদের বিশ্রাম নেওয়ার অবকাশ নেই। ভাদ্র মাস হল বিশ্রামের মাস, ভাদ্র মাসের এই অবসর যেন দীর্ঘ সংগ্রামের পর জয় লাভের আশার আনন্দে ভরপুর সারাটা বছর এই কয়েকটা মাসের দিকে তাকিয়ে থাকে চাষীরা। প্রতীক্ষার এই সময়টিকেই তাই বেছে নিয়েছে নারী সমাজ। শুরু হয়েছিল ভাদুর যাত্রা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ভাদু উৎসব পালনকারী নারীর কণ্ঠে শোনা যায় এই ভাদু গানটি—

"ভাদু পূজার দিনে ...
সারারাত উড়াব ফুর্তি হে কাটার জাগরণে
বাকি আজ রাইখো না কিছু যা ইচ্ছা আছে মনে।
(রাখ) লোকলজ্জা দাও দরজা মহা পূজা এই
এইখানে ...
অথবা
আজকের ভাদু পূজা
বছর মাঝে একটি রাতই লো উড়াতে প্রাণের ধ্বজা
বাধা বারণ কিসের কারণ হে,
আজ খুলা সব দরজা
নেই কোনো ভয় মনে মোদের আজকে রাতের
মোরা রাজা।"[১১]

এই গানের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নারীর মনের বা নারী সমাজের আদি অকৃত্রিম চাহিদা এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সারা রাত জাগরনের মধ্য দিয়ে তারা ফুর্তি করবে। এক রাতের জন্য তাঁরা কোন বাঁধা বারণ মানবে না। আজ রাতের জন্য তারা রাজা অর্থাৎ এটা স্পষ্ট ভাদু উৎসব যেন নারী মুক্তির উৎসব।

অর্থাৎ ভাদু উৎসব অতি প্রাচীন উৎসব। কালের ব্যবধানে হয়তো প্রাচীন সঙ্গীতগুলি হারিয়ে গেছে। যতই দিন যাচ্ছে গ্রাম কেন্দ্রীক সমাজের হচ্ছে রূপান্তর। শিল্পীদের ঘটছে অভাব। অর্থনৈতিক আক্রমণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে জীবন। সব গিয়েও এখনো বেঁচে আছে প্রাচীন সুরটি ভাদু গানের সুর বলে যা এই অঞ্চলে অতি পরিচিত। আমি ক্ষেত্রসমীক্ষা কালে ব্যক্তিগত ভাবে ভাদু শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলি যারা পুরো দিন দুমুঠো ভাতের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেও নিজেদের গলার সুরে জীবিত করে রেখেছে ভাদু গানকে। তাদের এই সুরকে অবলম্বন করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, চতুর্থ খন্ড, মুখার্জী অ্যানড কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭, পৃ. ১৬০৭

২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ. ১৬০৭

৩. চক্রবর্তী, সুব্রত, ভাদু, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২০০১, পৃ. ৯

৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ. ৯

৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ. ১০

৬. চৌধুরী, রামশঙ্কর, ভাদু ও টুসু, কথাশিল্প, জানুয়ারী ১৯৮১, পৃ. ৮

৭. চক্রবর্তী, সুব্রত, ভাদু, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২০০১, পৃ. ১০

৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ. ১১

৯. চৌধুরী, রামশঙ্কর, ভাদু ও টুসু, কথাশিল্প, জানুয়ারী ১৯৮১, পৃ. ১১

১০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ. ১১

১১. চক্রবর্তী, সুব্রত, ভাদু, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২০০১, পৃ. ২১